ভগিনী নিবেদিতা নির্মাণে ভারত : একটি সমীক্ষা

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

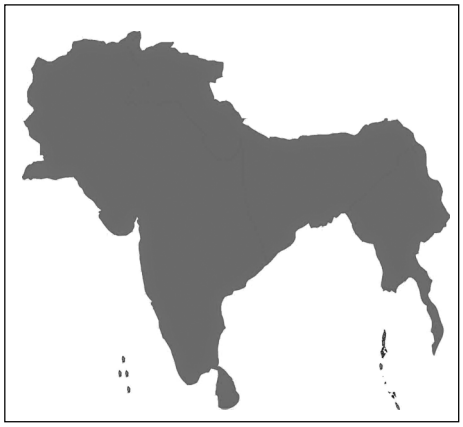

ভগিনী নিবেদিতার মহাপ্রয়াণের পর স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ তাঁর সমাধির ওপর একটি ফলকে লিখেছেন—"Here repose the ashes of Sister Nivedita (Margaret E Noble) of the Ramakrishna-Vivekananda who gave her all to India." এত সংক্ষিপ্ত অথচ এত গভীর ভাবদ্যোতক, এমন বাঙ্ময় এই বাক্যটি যে আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না, শুধু আমাদের অনুভূতিতে আলোড়ন তোলে।

তবে এই মহান Tribute আমাদের একটু চিন্তাতেও ফেলে দেয় বই কী। একথা তো নিঃসন্দেহে সত্য যে, ভগিনী তাঁর সর্বস্ব নিঃশেষে নিবেদন করেছেন ভারত-কল্যাণে, সানন্দে ও সপ্রেমে—তাঁর শরীরস্বাস্থ্য, মনপ্রাণ, জীবনযৌবন, অর্থসামর্থ্য। তাঁর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, রাগ-অনুরাগ—সবই যে আবর্তিত হয়েছে ভারতকে কেন্দ্র করেই, একথাও তো নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তৎসত্ত্বেও কি একটি প্রশ্ন আমাদের মনকে পীড়িত করে না যে ভারত তার প্রতিদানে কী দিয়েছে বা দিতে পেরেছে? কিছুই কি দেয়নি, শুধু নিয়েছেই দুহাত ভরে? এ-ভাবনাতেও তো আবার মন সায় দেয় না। কিছু positive বা সদর্থক উত্তর খুঁজতে আগ্রহী হয়। তারই আলোচনায় ব্রতী এ-প্রবন্ধকার, অবশ্যই সাহস অবলম্বন করে ও ভগিনী নিবেদিতার চরণে অগ্রিম ক্ষমা প্রার্থনা করে।

দার্জিলিঙে ভগিনীর সমাধিফলক

আয়ারল্যান্ড-দুহিতা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বগঠনে তাঁর স্বদেশ, তাঁর জন্মস্থান, গৃহপরিবেশ, পিতা-মাতা, তাঁদের লালন-পালন, তাঁর বিদ্যালয়, পরবর্তীতে লন্ডনের উইম্বলডন শহর, যেখানে পাশ্চাত্যের জ্ঞানীগুণী মনীষীবৃন্দের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানে তাঁর মেধাবুদ্ধির আরও বিকাশ, আরও শাণিতকরণ হয়েছে—এসবের অবদান অবশ্যস্বীকার্য। তেমনই কি ভাবতে পারি না যে তাঁর পরবর্তী জীবনযাপনের নতুন আবাসস্থল—কলকাতা তথা

ভারত—তার পরিবেশ, মানুষজন, সুগভীর ধর্মদর্শন চর্চা, সহজ সরল জীবনধারা,—এসবও তাঁর ক্ষেত্রে মহার্ঘ্য অবদান রেখেছে, তাঁকে নতুন পথে পরিচালিত করেছে, তাঁর জীবনকে, মননকে নব আলোকধারায় স্নাত করে সমৃদ্ধ করেছে! মার্গারেট তাঁর নিজভূমে যে-ধর্মচর্চা বা চার্চকেন্দ্রিক ধর্মজীবন দেখেছিলেন, তা তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি। তাঁর মনের গভীরে প্রোথিত এক জিজ্ঞাসা তাঁকে অশান্ত করেছিল যে, ধর্ম কি শুধুই কতকগুলি নিয়মনিষ্ঠার সমাহার, বা কিছু আচার-অনুষ্ঠান-অনুশাসন নির্ভর? তা কি সমাজকেন্দ্রিক হতে পারে না বা তাতে কি সকলের জন্য সমান সমাদরের স্থান নেই? কেন? ঈশ্বর তাহলে কি নিরপেক্ষ বা উদার নন? এক ধর্মের ঈশ্বর কি অন্য ধর্মেরও ঈশ্বর হতে পারেন না? মার্গারেট লক্ষ করেছিলেন খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণ অখ্রিস্টান ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন এবং তাদের আচরিত ধর্মকে সত্যের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত। ধর্মের ক্ষেত্রে এই ভেদদৃষ্টি তাঁর মনের সমর্থন পায়নি এবং এই সপ্রশ্ন অশান্ত মন নিয়েই তিনি চার্চের সংশ্রব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণামাতাজী ভগিনীর জীবনীগ্রন্থে লিখেছেন, ধর্মের সত্যরূপটি জানার ও আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতা লাভের জন্য ছোট থেকেই তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও পিপাসা ছিল, যা পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারেনি নিজ দেশে। তাঁর সেই সংশয় ও অসন্তোষের চিরনিরসন হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে ভারতের বেদ-বেদান্তভিত্তিক উদার, গণতান্ত্রিক, বিজ্ঞানসম্মত বা যুক্তিনিষ্ঠ ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করে। নিজের জীবনে ভারতের এই মহান অবদান তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তিনি মিস ম্যাকলাউডকে চিঠিতে লিখেছিলেন, যদি সেইসময় তিনি স্বামীজীর সংস্পর্শে না আসতেন, তবে তাঁর জীবন নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ হয়ে যেত! আমরা এর সঙ্গে যোগ করে দিতে পারি, 'অনেক সম্ভাবনা সহই'।

স্বামী বিবেকানন্দ নামক এক মহান সমন্বয়ী ধর্মনায়ক, জননায়ক, সত্যপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি যেন ভারতেরই পাশ্চাত্যের প্রতি এক অনন্য উপহারস্বরূপ, যা পূর্ণরূপে সহায়ক হয়েছিল মার্গারেট নোবলের তৎকালীন ভাসমান মানসিক অনিশ্চয়তাকে এক সুস্থির তীরভূমিতে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে। স্বামীজীও মার্গারেটকে এদেশের কাজের জন্য আহ্বান করে আনার পর বলেছিলেন, মার্গারেট ভারতের জন্য পাশ্চাত্যের উপহার। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কাছেই ভারতের অত্যুচ্চস্তরের ধর্মদর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতির গৌরবগাথা প্রথম শুনেছিলেন। প্রতীচ্যের মদগর্বী ধনতান্ত্রিক জড়সভ্যতা ও সংস্কৃতির থেকে তার পার্থক্য অনুধাবন করে, তার উদারতায় ও সর্বজনীনতায় মুগ্ধ হয়ে ভারতের কাছে নিবেদিতা অবনতশির হয়েছিলেন এবং সেইসঙ্গে নিজ সুপ্ত প্রবণতার সার্থক প্রকাশমাধ্যম খুঁজে পেয়ে নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কারের আনন্দে অধীর হয়েছিলেন। তিনি একদিন স্বামীজীর কনিষ্ঠভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে এরই স্বীকারোক্তিরূপে প্রশ্নচ্ছলে জানিয়েছেন—আমার মতন আর কোনও বিদেশি কি স্বামী বিবেকানন্দের মতন এমন ভারতব্যাখ্যাতা পেয়েছেন? জিজ্ঞাসার মধ্যেই ছিল অনুচ্চারিত উত্তরটি—না পাননি। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের বিবেকানন্দ একবারই জগতে আবির্ভূত হয়েছেন, যিনি নিজের সম্বন্ধে ঘোষণা করার এই গৌরবান্বিত অধিকারটি অর্জন করেছিলেন : 'I am India'। মার্গারেট নোবলের কাছে তিনি সত্যসত্যই হয়ে উঠেছিলেন 'Condensed India'। ভারতবর্ষ ও বিবেকানন্দের মধ্যে যে-একাত্মতা তিনি লক্ষ করেছেন, তার মাধ্যমেই ভারতের ঐশ্বর্যসম্ভার—তার নদনদী, উপত্যকা, পাহাড়-পর্বত, জনজীবন, পারিবারিক জীবনের সরল অনাড়ম্বর সৌন্দর্য,

ধর্মজীবনের ব্যাপকতা ও গভীরতা, ত্যাগ, সেবা, হৃদয়মাধুর্য এবং একইসঙ্গে তার পরাধীনতার মর্মবেদনা—এসবই প্রত্যক্ষ করার বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। সেই কারণেই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে তাঁর ওই জিজ্ঞাসাটি রেখেছিলেন বলে মনে হয়। নিবেদিতা 'The Master as I Saw Him' গ্রন্থে স্পষ্ট স্বীকৃতি দিয়েছেন যে স্বামীজীর ঐকান্তিক, তীব্র স্বদেশপ্রেমের কাছেই তিনি নতশির হয়েছিলেন ও তাঁকে 'গুরু' বলে মেনে নিয়েছিলেন। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে যে-ভারতাত্মা নিজেকে মেলে ধরেছিলেন তাঁর কাছে, সে-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও সে-গৌরব জানাতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হননি। এ-আনন্দ তাঁর পূর্বজীবনে অনাস্বাদিতই ছিল।

যে-কলকাতার রত্নসন্তান ছিলেন স্বামীজী, সেই কলকাতারই বাগবাজার অঞ্চলে এক সংকীর্ণ গলিতে নিবেদিতা বসবাস শুরু করেন। সেই কলকাতা যে শুধু তার মলিন, জীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন, দারিদ্র্যপীড়িত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষিত জনগণকে তাঁর সামনে উপস্থিত করেছিল তা-ই নয়, একইসঙ্গে তাঁকে, বিবেকানন্দের ধ্যানধারণার বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী কিছু জ্ঞানী, গুণী, ধনী, মানী অভিজাত বঙ্গসন্তানদের সঙ্গেও পরিচিত করিয়ে দিয়েছিল। কোনও সম্প্রদায়গত বা ভাবগত বিভেদ না রেখেই তাঁরা খোলা মন নিয়ে ভগিনীর সঙ্গে আলাপাদি করতে তাঁর সমীপে উপস্থিত হতেন। সুতরাং স্বামীজীকে তিনি যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন কলকাতার আর এক অতি গৌরবান্বিত ব্যক্তি, সমকালেই প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, যিনি পরবর্তীকালে নিবেদিতাকে সর্বোচ্চ tribute দিয়েছেন। সেইসঙ্গে স্বদেশি আন্দোলনের পুরোধাগণ—দেশপ্রেমিক, উচ্চশিক্ষিত শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, শিল্পী নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিত কুমার হালদার, বিজ্ঞানী গবেষক জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ ভারতের বহু কৃতী সন্তানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছেন নিবেদিতা। পরস্পর ভাবের আদানপ্রদানে যে উভয়েই সমৃদ্ধ হতেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ভারত যেমন তৎকালে ব্রিটিশের অধীন ছিল, তেমনি মার্গারেট নোবলের স্বদেশ আয়ারল্যান্ডও পরাধীন ছিল এবং এই পরাধীনতার বেদনা নিয়েই তিনি স্বভূমি ছেড়ে আসেন। যদিও তাঁর পিতামহ ও পিতা স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনে সহায়তা করেছিলেন, মার্গারেটের সে-সুযোগ হয়নি। কিন্তু দেশপ্রেমের বীজটি তাঁর মধ্যে সুপ্ত ছিলই, এবং স্বামীজীর মধ্যে স্বদেশপ্রেমের তীব্র আন্তরিক প্রকাশই যে তাঁকে তাঁর অনুগত করেছিল, সেকথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন।

দেখতে পাই ভারতবর্ষ নিবেদিতার সেই অপূর্ণ বাসনা পূরণের সুযোগ করে দিয়েছিল। ভারতকে তিনি নিজ মাতৃভূমির মর্যাদা ও ভালবাসা দিয়েছেন; তার স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত বিপ্লবীদের নানা উপায়ে, অকৃপণভাবে সাহায্য ও সেবা দিয়েছেন ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। ভারত ও আয়ারল্যান্ড—উভয়ের ক্ষেত্রেই শত্রু ও অত্যাচারী শাসক ব্রিটিশদের উচ্ছেদে এ-দেশের মানুষকে স্বাধীনতালাভে সহায়তা করার সুযোগ পেয়ে তিনি কিছুটা আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন নিশ্চয়ই। বলা যেতে পারে ভারতমাতা এ-কাজে যুক্ত করে তাঁকে যেন ধন্য করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া স্বামীজীর অভিপ্রেত ছিল না জেনেও কিন্তু তিনি পশ্চাৎপদ হননি, তার কারণ তাঁর সুপ্ত ও অবদমিত স্বদেশপ্রেম যেন ভারতের সমসংকটের ক্ষেত্রে জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল না হয়ে থাকতে পারেনি। ফলে তাঁর স্বদেশের জন্য যে-মনোবেদনা

ছিল, তা এখানে কিছু পরিমাণে হলেও প্রশমিত হতে পেরেছিল বলেই বোধ হয়।

এদেশের বরণীয় ব্যক্তিত্বসকল—মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীবৃন্দ, যাঁদের একটি তালিকা নিবেদিতা তাঁর রচনায় সংযোজিত করে আমাদের মুগ্ধ করে দিয়েছেন, তাঁরাও কি অলক্ষ্যে তাঁর চরিত্রে বা ব্যক্তিত্বে যথেষ্ট অবদান রাখেননি? তাঁদের মহিমান্বিত জীবনধারা যদি তাঁর অন্তঃকরণকে আলোকিত না করত, তবে কি তিনি তাঁদের জীবনের তাৎপর্য বা মর্ম গ্রহণে সক্ষম হতেন? বলা বাহুল্য, এমন সব জীবনের সঙ্গে তিনি ওদেশে পরিচিত ছিলেন না; এঁদের দেখা তিনি এদেশে এসেই পেয়েছেন।

তবে নিবেদিতার জীবনে ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান অবশ্যই বিবেকানন্দ-গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ—যাঁকে তিনি প্রত্যক্ষ করেননি; শুধু শুনেছেন তাঁর কথা, দেখেছেন মানসনেত্রে। রামকৃষ্ণদেবের জীবন অনুধ্যান ও তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যসন্তানদের পবিত্র আনন্দময় সংস্পর্শ নিবেদিতাকেও যে নিশ্চিতভাবে অধ্যাত্মমার্গে, ধর্মীয় অনুভবের উচ্চস্থানে পৌঁছে দিয়েছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে ধ্যানে বসে ভাবে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কণ্ঠস্বরে শুনেছিলেন, ''My own are ever mine''—অর্থাৎ রামকৃষ্ণদেব ভগিনীকে আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে নিবেদিতা তাঁর চিরকালের আপনার জন। তিনি মিস ম্যাকলাউডকে চিঠিতে অতি পুলকিত চিত্তে এ-বার্তা পাঠিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গেই।

আবার এই কলকাতাতেই নিবেদিতা জগতের 'মহত্তমা নারী', শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য 'বিশ্বপ্রেম ধারণের পাত্র' (তাঁর নিজেরই লেখনীজাত শব্দ) শ্রীমা সারদা দেবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, যিনি নিবেদিতার মতে জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে, পবিত্রতায়, সেবায়, ত্যাগে, অধ্যাত্মজীবন ও সংসারজীবনের সমন্বয়ে এক অনন্য, অতুলনীয় চরিত্ররূপে—শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ভাষায় 'ধ্রুবমন্দির'রূপে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছেন। এই অমৃতজীবনধারায় স্নাত হয়েই তিনি ঘোষণা করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে : ''জগতের মহত্তমা নারী''। এই অভাবনীয় সৌভাগ্যের অধিকারী তিনি এখানে এসেই যে হয়েছেন, তা স্বীকারে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না।

প্রশ্ন জাগতে পারে, ভগবান যিশুর জননী পবিত্রতমা মাতা মেরি কি তবে তাঁর কাছে শ্রীসারদা দেবীর তুলনায় নগণ্য ছিলেন? না, নিশ্চয়ই নয়। তবে তিনি আদর্শ হিসাবে একই হলেও, তাঁকে শ্রীশ্রীমার মতো জীবন্তভাবে পাওয়া যায়নি; আর তাঁর জীবন ও কার্যাবলিও সকলের জ্ঞাত নয়। শুধু ঈশ্বরজননীরূপেই তিনি খ্রিস্টসমাজে পূজিতা। তাঁর কোনও ব্যক্তিগত বা সমাজকেন্দ্রিক ভূমিকার কথা জানা নেই, বা তাঁর কোনও ক্রিয়াকর্মেরও উল্লেখ নেই। কিন্তু শ্রীশ্রীমার সঙ্গে বসবাস করে নিবেদিতা প্রত্যক্ষ করেছেন এক মহান দৈবী জীবনচর্যা যা একটি পরিবারকেন্দ্রিক হয়েও বিশ্বজীবনের সঙ্গে অনায়াসে মিলিত হয়েছে, দেখেছেন এক ব্যাবহারিক ও ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার সুষ্ঠু মিলন, যা উচ্চতম ও দীনতমের মধ্যে সমীকরণে সফল। লক্ষ করে মোহিত হয়েছেন, সংসারের অজস্র খুঁটিনাটি কর্তব্যকর্মে ব্যাপৃত থেকেও শ্রীশ্রীমা মনটিকে সদাই অধ্যাত্মমার্গে স্থিত রাখতে সমর্থ। বাগবাজারের সংকীর্ণ, গোঁড়া প্রাচীনপন্থী মানুষদের কাছাকাছি বাস করেও, এমন একটি অতিদুর্লভ জীবন্ত দেবীপ্রতিমার সঙ্গ যে নিবেদিতা লাভ করতে পেরেছিলেন, সে কি তিনি তাঁর অনন্ত সৌভাগ্য বলেই মনে করেননি? এ-ও কি তাঁর কাছে ভারতের এক অনন্য অবদান ছিল না?

আর যে ব্রহ্মশক্তি জগজ্জননী কালীরূপে বঙ্গদেশে পূজিতা, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

ইষ্টদেবীরূপে আরাধিতা, যাঁর রূপকল্পনা নিবেদিতার পূর্বজীবনের ভাবনাচিন্তার কোনও কোণেই এতটুকুও ছায়া ফেলেনি, সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধীশ্বরীর সম্যক্ ধারণা তাঁর জীবনে কি এক নবদিগন্ত উন্মোচিত করে দেয়নি? সেও কি কলকাতার দাক্ষিণ্য বলে ধরে নেব না? এই ধারণা তাঁর চিত্তের, তাঁর মননের যে-সম্যক্ সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিল, তা তিনি স্বীকার না করে পারেননি। আবার তিনি শুধু ধারণা করেই ক্ষান্ত হননি, স্বামীজীর মুখে মা কালীর ভয়ংকর সুন্দর মাতৃরূপের গভীর তাৎপর্য, মানবজীবনের উত্তরণে তার ভূমিকা—এসব শুনে, গভীরভাবে তা চিন্তা করে সে-সত্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন ও সে-সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে স্বামীজীর অনুমোদনে কলকাতার অ্যালবার্ট হল ও পরে কালীঘাটের মন্দিরচত্বরে শহরের বিদ্বজ্জনের সামনে পাঠ ও অপূর্বভাবে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। তিনি নিজেও এর দ্বারা যথেষ্ট আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করেছেন। এসবই তাঁর জীবনে ছিল এক মহান প্রাপ্তি, যার কাছে তাঁর কলকাতা-বাসের কষ্টকর দিনগুলি, তার অস্বাচ্ছন্দ্য, অত্যধিক পরিশ্রম ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

নিবেদিতা এদেশে এসে আরও পেয়েছেন স্বামীজীর গুরুভ্রাতাদের—সেইসব শুদ্ধসত্ত্ব, বৈরাগ্যবান ঈশ্বরপ্রেমিক সন্ন্যাসীর সংস্পর্শ, তাঁদের সস্নেহ ব্যবহার, সেইসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করার অধিকার, যা তাঁকে অতিমাত্রায় ঋদ্ধ করেছিল নিশ্চয়ই। তিনি প্রথম থেকেই অসাধারণ কর্মী ছিলেন, এবং পূর্বে সেই কর্মকেই উপাসনাবোধে জীবনপথে স্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর কাছে প্রাপ্ত এক অভিনব বার্তা তাঁকে পরিবর্তিত পথে চালিত করে এক পরমা শান্তির দুয়ারে উপস্থিত করে দেয়। স্বামীজী তাঁকে জানান কর্ম বা উপাসনা উপায়মাত্র, উদ্দেশ্য নয়। সকল কর্মের ঊর্ধ্বে যে-শান্ত, মৌন, অবিচলিত ভাব, তা-ই অধ্যাত্মজীবনের কাম্য বা উদ্দেশ্য। ভগিনী এই সত্যানুভূতিতে আরূঢ় হন শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্যে এসে। মায়ের গভীর প্রশান্ত ভাব, কর্মচঞ্চল নিবেদিতাকে যেন আকর্ষণ করে নিয়ে যেত এক পরমা শান্তির আলোয়। একটি কথাও না বলে তিনি চুপ করে বসে থাকতেন তাঁর সম্মুখে, অপার আনন্দ হৃদয়ে ধারণ করে।

শ্রীমা সারদা ও ভগিনী নিবেদিতার মুখোমুখি বসে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকার যে-চিত্রখানি আমাদের অতি পরিচিত ও প্রিয়, সেটি দেখে অনেকেরই মনে হয় যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যেন মহামিলন ঘটেছে। অবশ্যই এভাবে ছবিটির ব্যাখ্যা হতে পারে। তবে এমনটিও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে একটি চঞ্চল, প্রখর গতিবেগসম্পন্ন নদী যেন তার গতি প্রশমিত করে সমুদ্রের প্রশান্ত, গভীর অতলস্পর্শিতায় নিজেকে সঁপে দিতে এসেছে এবং এতেই তার চরিতার্থতা খুঁজে পেয়েছে। নিবেদিতার এই ভাবটি তাঁর মিস ম্যাকলাউডকে লেখা একটি চিঠিতে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে : ''বিদেশ থেকে ফিরে এসে মাতাদেবীর (শ্রীমা) সান্নিধ্যে যেতে পারছি, কী যে অপূর্ব লাগছে... জীবন (কর্ম) যেন অর্থহীন, কর্মহীন (হয়ে পড়েছে)... আঃ ভাবতেও অসীম শান্তি; আগে কেন বুঝিনি মা গো যে তোমার শ্রীচরণের কাছে ছোট্ট মেয়েটির মতন বসে থাকাটাই সবকিছু (পাওয়া); তোমার ভালবাসায় আমাদের মত উচ্ছ্বাস, উগ্রতা নেই, স্নিগ্ধ শান্তি তা...। সেদিন (মা) তুমি যখন আশীর্বাদ করলে, কি যে শান্তি আর মুক্তি বোধ করেছিলাম।... আমি তোমার কাছে শুধু শান্ত হয়ে চুপটি করে বসে থাকব...। ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব, তা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে, যেমন বাতাস, সূর্যের আলো, গঙ্গার মাধুরী—এসব শান্ত নীরব

জিনিসগুলি সবই তোমারই মতন।" শ্রীমাকে তিনি অনির্বচনীয় মাধুর্যের নির্ঝররূপে অনুভব করেই মৌন আনন্দে ভেসেছেন এবং এই আবিষ্কারে নিজেকে ধন্যাতিধন্য বোধ করেছেন।

ভারতের জীবনচর্যা দেখেই ভগিনী এ-সত্য হৃদয়ঙ্গম করেছেন : ''সৌজন্যবোধ জনজীবনের সংঘর্ষকে কোমল করে এবং যেসব সামাজিক আবেগ সৌজন্যবোধকে আন্তরিকতাপূর্ণ ও সহজ করে তোলে, সেগুলি মানবতার এক মহামূল্য সম্পদ।" ভারতে এই সম্পদ তিনি সুরক্ষিত দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, ভারতীয় জীবনে অন্তঃপুরের মধ্যে যেখানে লক্ষ্মী বাস করেন, নিবেদিতার দৃষ্টি সেই হৃদয়লক্ষ্মীকে অনুভব করেছে। তার ফলেই তিনি বুঝেছেন যে ভারতীয় নারীর জীবন ভারতেরই মৃত্তিকা থেকে উদ্ভূত একটি মনোরম কবিতার মতো। সেইসঙ্গে তাঁর নিজ দেশের নারীদের পরিচিত চিত্রটি তুলে ধরে ভারতকন্যাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে পাশ্চাত্যের আধুনিক আদবকায়দা ও আড়ম্বর যেন ভারতীয় নারীর বিনম্র সৌজন্য ও আন্তর-সুষমাকে বিনষ্ট না করে।

ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, শাস্ত্র, পুরাণ, মহাকাব্য—এসবের সঙ্গে নিবেদিতা গুরুর মাধ্যমে পরিচিত হয়েছেন এবং গুরুর অনুধ্যান অনুসরণেই নিজ গভীর মননশীলতায় অবগাহন করে তুলে আনতে সক্ষম হয়েছেন ভারতসংস্কৃতির মহিমময় ললিত ভগ্নাবশেষ। আর এসবের মাধ্যমেই তাঁর মার্গারেট নোবল থেকে ভারতকন্যা ভগিনী নিবেদিতায় সার্থক উত্তরণ সম্ভব হয়েছে।

ভারতের সমাজে, জনজীবনে ছিল অশিক্ষা, দারিদ্র্য, সংকীর্ণ সংস্কারবদ্ধতা যার কথা স্বামীজী ভারতে আগমনের পূর্বে তাঁকে জানিয়ে সচেতন করে দিয়েছিলেন যে কেমন পরিবেশ, পরিস্থিতিতে তাঁকে কাজ করতে হবে। নিবেদিতা কিন্তু এসব বিরুদ্ধ অবস্থাকে অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ করেছেন ভারতীয় জীবনে অন্তর্লীন এক অপূর্ব অনাসক্তি, মৌনমাধুর্য, শ্রীমণ্ডিত শান্তি, প্রসন্নতা, যা তাঁর পূর্বের কর্মময়, ঝটিকার মতো গতিশীল জীবনে অনাস্বাদিত ছিল; এবং তাতে কৃতার্থ বোধ করেছেন। তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বিশেষ বন্ধু নেল হ্যামন্ডকে চিঠিতে লিখেছেন, ''Oh, Nell, Nell, India is indeed a holy land." এইসব মহান প্রাপ্তির জন্য তিনি ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের কাছে তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

এইখানেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে বেদান্তধর্মের মূলতত্ত্বটি—সর্বভূতে চেতনার অধিষ্ঠান, বা শুদ্ধজড় বলে কিছুই নেই—যে-সত্য ভারতের ঋষিদের ধ্যানে উদ্ভাসিত হয়েছিল একদা—তাকে গবেষণাগারে হাতেকলমে প্রমাণিত হতে দেখলেন ভগিনী নিবেদিতা। জড় ও চেতনের মধ্যে যে-পার্থক্য এতকাল ধরে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার নিরাকরণ করলেন এই কলকাতারই এক বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি প্রমাণ করে দেখালেন যে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম—যাদের আপাতদৃষ্টিতে প্রাণহীন, অচেতন বলে মনে হত তারা প্রাণবন্ত, চেতন। ভগিনী স্বামীজীর কাছে শুনেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন তাঁর দিব্যশক্তির প্রভাবে স্বামীজীকে ঘটি, বাটি, দরজা, চৌকাঠ—এসব জড়বস্তুকে চৈতন্যময়রূপে দর্শন করিয়ে তাঁকে বিস্ময়বিমূঢ় করে দিয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র সেই সত্যের দিকেই একধাপ অগ্রসর হলেন। নিবেদিতা পাশ্চাত্যজগতে যে-বিজ্ঞানসাধনা দেখেছেন, তা জড়প্রকৃতির নিয়মাবলি ও তার রহস্য উন্মোচনে তৎপর। কিন্তু ভারতেই তিনি প্রথম দেখলেন বিজ্ঞানের সহায়তায় নিগূঢ় অধ্যাত্মসত্যের প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা। এ-আবিষ্কার নিঃসন্দেহে তাঁর অধ্যাত্মজীবনে এক নবদিগন্তের উন্মোচন করেছিল।

স্বামীজীর সঙ্গে উত্তরাখণ্ড পরিভ্রমণে গিয়ে

নিবেদিতা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দু সাধুদের দেখেছেন। জাগতিক ব্যাপারে তাঁদের নিস্পৃহভাব, তীর্থের পথে তাঁদের ঈশ্বরতন্ময়তা, নিরন্তর ভগবৎপ্রসঙ্গ তাঁকে অধ্যাত্মজীবন সম্বন্ধে এক নতুন অভিজ্ঞতা দিয়েছিল। স্বামীজীই দেবতাত্মা হিমালয় দর্শনে, উত্তরভারতের তীর্থভ্রমণে নিবেদিতাকে আহ্বান করে নিয়ে গিয়েছিলেন ভারতাত্মার যথার্থ পরিচয়টি তাঁর কাছে তুলে ধরবার জন্য। তিনি ভগিনীকে বলেছিলেন, ''Come on this journey, I will make you twenty''। এই 'এক' থেকে 'বিশগুণ' হওয়ার সুযোগ ও সৌভাগ্য তিনি ভারতের মাটিতেই লাভ করেছেন। নিজ গুরুর সঙ্গ ছাড়াও তিনি ওই তীর্থপথে অন্যান্য সাধু-ফকিরদেরও কিছু সেবা ও সাহায্য লাভ করেছিলেন। তিনি দেখলেন ভারত সবাইকেই আপন করে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে, তার প্রত্যাখ্যানের ভাবটি নেই। শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজী ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যটির ওপরেই জোর দিয়ে বলেছিলেন, ''We not only tolerate but accept''। এই 'আপন করে নেওয়ার' ভাবটি নিবেদিতা নিজ দেশে ধর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ দেখেননি। স্বামীজী জানিয়েছেন যে নিবেদিতাকে গড়ে তুলতে তাঁকে সবচেয়ে বেশি সময় ও শ্রম দিতে হয়েছিল। নিবেদিতা এই তীর্থভ্রমণরত সাধুসমাজের সরল অনাড়ম্বর জীবন, ভগবানের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন, ঐকান্তিক ব্যাকুলতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নিজ দেশের চার্চের কিছুটা formal ধর্মচর্চার সঙ্গে তুলনায় ভারতের ধর্মজীবনকে অনেক বেশি সরল, সমাজমুখী ও প্রাণবন্ত বলে ধারণা করতে পেরেছিলেন।

স্বামীজী পাশ্চাত্যে থাকার সময় গুরুগম্ভীর ধর্মালোচনার মাঝে কখনও কোনও মজার প্রসঙ্গের উত্থাপন হলে নিজেও হাসতেন ও সকলকে হাসাতেন। এতে কেউ কেউ আশ্চর্য হতেন, কারণ তাঁরা ধর্মীয় ব্যক্তিদের, বিশেষ করে চার্চের ফাদারদের হাসি-ঠাট্টা-মশকরা করতে কখনও দেখেননি। স্বামীজী মন্তব্য করেছেন, ওদেশে যাজকদের 'long face' বা গাম্ভীর্য অবলম্বন করেই থাকতে হয় সর্বদা, বা থাকাটাই নিয়ম অন্তত বাইরের মানুষদের কাছে, তা না হলে তাঁদের ধর্মজীবনের গভীরতায় সাধারণের সন্দেহ জাগে। কিন্তু নিবেদিতা এদেশের সাধুদের ক্ষেত্রে বিপরীতভাবই দেখেছেন। তাঁর গুরুর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হাস্যপরিহাসের, রসিকতার অনেক কথাই তিনি শুনে থাকবেন, যিনি মুহুর্মুহু সমাধিমগ্ন থাকতেন। ভারতে এসে স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইদের সঙ্গে মিশে তিনি দেখেছেন কত সরল ও আনন্দময় তাঁদের কথাবার্তা ও ব্যবহার। এ তাঁর কাছে অবশ্যই ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা।

ভারতে এসেই নিবেদিতা প্রত্যক্ষভাবে মাতৃরূপে ঈশ্বরের আরাধনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। যে-কালীমূর্তি বিদেশির চোখে ভীষণ ও ভয়ংকর বলে প্রতিভাত হয়, গুরুকৃপায় তাঁকে তিনি বিশ্বজননীর স্থানে বসিয়ে হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করতে পেরেছিলেন। এই সাকার মাতৃ-আরাধনায় ভক্তহৃদয়ের ব্যাকুলতা, মাতা-সন্তানের আন্তরিক ভালবাসার সম্পর্ক—যা তিনি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ মাতৃসাধকদের রচিত সংগীতাদির মাধ্যমে অনাবিলভাবে উপভোগ করেছিলেন সেগুলি স্বামীজীর কণ্ঠে শ্রবণ করে—এসব ভগবদ্‌ভাব অবশ্যই তাঁকে এক আনন্দময় নবধর্মচেতনায় উত্তীর্ণ করে দিয়ে তাঁর হৃদয়মনকে সমৃদ্ধ করেছিল।

নিবেদিতা বুঝেছিলেন ভারতে না এলে তিনি এখানকার সমাজজীবন, ব্যক্তিজীবনের পরতে পরতে যে-ধর্মভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে, তা ধারণা করতে পারতেন না। তিনি স্বামীজীর কাছে পূর্বে শুনেছিলেন মাত্র যে ভারতীয়েরা ধর্মের ভাবেই খায় পরে, আচার-আচরণ করে, ধর্মের ভাবেই

তাদের নিত্য জীবনযাপন। স্বামীজীর কাছেই এই উচ্চতম জীবনাদর্শের কথা তিনি শুনেছিলেন যে 'Whole life is religion', 'life itself is religion', এখানে part time ধর্মচর্চার চল নেই। ভগিনী হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে এদেশে না এলে, এর জনজীবনে মিশে না গেলে এই সুন্দর আনন্দময় অনুভূতিগুলির সন্ধান তিনি পেতেন না।

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর পবিত্র, স্নিগ্ধ, স্নেহময় সঙ্গ, তাঁর মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহারের তুল্য কিছুই নিবেদিতা পেয়ে আসেননি পূর্বজীবনে। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি প্রসঙ্গে—''যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।'' ভগিনীর মনোভাব নিশ্চয়ই এমনটিই হয়েছিল। মা কালী ও শ্রীমা সারদা তাঁর হৃদয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। এ ছিল জগজ্জননীর দ্বিবিধ রূপের প্রকাশ তাঁর কাছে—একজন রুদ্রমূর্তিতে খড়্গাধারিণী হয়ে শত্রুদের থেকে সন্তানের রক্ষাকল্পে বিরাজিত, অন্যজন শান্ত মধুর মাতৃরূপে সেই সন্তানদেরই প্রতিপালনে সদা রত। ভগিনী নিবেদিতার মননে এই একাত্মতা নিশ্চিতভাবেই ধরা পড়েছিল। তিনি একদিন শ্রীমাকে বললেন আবেগাপ্লুত হয়ে : ''মা আপনি হন আমাদিগের কালী।'' শ্রীমা অবশ্য তৎক্ষণাৎ হেসে হালকা জবাব দিয়েছিলেন : ''না বাপু, আমি জিব বার করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না'', যদিও একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো শিবুদাদার প্রবল জেদের কাছে পরাজিত হয়ে স্বীকার করেছিলেন যে তিনি 'কালী'।

প্রথম দিকে বাগবাজার পল্লি নিবেদিতাকে একটু দূরে সরিয়ে রেখেছিল, বা তাঁকে আপনার করে নিতে পারেনি ঠিকই, আর তা স্বাভাবিকই ছিল কারণ তিনি শাসক জাতির মহিলা, শ্বেতাঙ্গিনী, ভাষা ইংরেজি, আবার চালচলনও বাঙালি নারীদের ধারে কাছে নয়। সুতরাং ভয় ও সংকোচ দুইই তাদের ভগিনীর কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই নিবেদিতা পাড়া-প্রতিবেশীদের ঘরের কন্যা হয়ে উঠেছিলেন এবং তিনিও এই ঘিঞ্জি গলি থেকে অন্য কোথাও গিয়ে বসবাসের বাসনা করেননি। পল্লিবাংলার স্নিগ্ধ শান্ত ঈশ্বরমুখী পরিবেশ, অনাড়ম্বর সরল সাদাসিধে জীবনযাত্রা তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। যে-উদার আধ্যাত্মিক সত্য লাভের ইচ্ছা কৈশোর থেকেই মার্গারেটের মনকে অধিগ্রহণ করেছিল, তার পূর্ণতা প্রাপ্তি হল ভারতে আগমন করে পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার জীবন্ত বিগ্রহরূপে এই ত্রয়ীর—শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের বলয়ের মধ্যে প্রবেশ করে পরমা শান্তি ও আনন্দ লাভ করে। যে-নিরাকার ধর্মসাধনা বা সর্বব্যাপী এক ব্রহ্ম বা আত্মচৈতন্যের সাধনার কথা তাঁর পূর্বজীবনে একেবারেই অজানা ছিল, তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য যে কতখানি সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় ভাব জাগরণে, তা এঁদের জীবন কাছ থেকে না দেখলে নিবেদিতা ধারণা করতে পারতেন না। ধর্ম যে আকাশের মতো উদার ও সর্বজীবনকেন্দ্রিক এই সুউচ্চ অনুভূতিও যে তিনি লাভ করতেন না, তা তিনি বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ করে গেছেন। যদি মনে করি তাঁর নবজীবন নির্মাণে এসবই মহান ভারতবর্ষের অবদানস্বরূপ, তাহলে হয়তো বিশেষ ভুল বলা হবে না। রবীন্দ্রনাথকে যদি উদ্ধৃত করি ভগিনী নিবেদিতার মনের ভাবটি প্রকাশ করতে, যা ভারতের প্রতি তিনি উচ্চারণ করতে দ্বিধা করতেন না মনে হয়, তা হল : ''তোমারে যা দিয়েছিনু, সে তোমারি দান।''

অবশ্যই এখানে সংযোজন করা আবশ্যক যে যোগ্যতমের কাছেই সত্যের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, অন্যের কাছে নয়। ভগিনী নিবেদিতা সেই যোগ্যতমা ছিলেন নিঃসন্দেহে। ✠